SALTORA NETAJI CENTANARY COLLEGE

PROJECT WORK

NAME	: MADHUMITA MONDAL
SEM	: (4th)
ROLL	: (404)
UID NO.	: 2119120400 8
SUBJECT	: HISTORY
MOB NO.	: 8327474385

বিষয়— বিভিন্ন প্রকার মহাফেজখানা সম্পর্কে আলোচনা

Madhumita Mondal.
Student's Name.

S. Paul.
Teacher's Name.

মহাফেজখানা - প্রাথমিক ধারণা

প্রঃ- মহাফেজখানা বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন প্রকার মহাফেজখানা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উঃ-> মহাফেজখানা হল একটি নির্দিষ্ট স্থান যেখানে ঐতিহাসিক ও উপাদানসমূহ সংগ্রহ, সংকলিত ও সংরক্ষণ করে রাখা হয়। কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক যেসমস্ত ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ গৃহীত হয় সেগুলি প্রাথমিক উপাদান হিসেবে মহাফেজখানায় রক্ষিত থাকে। এই সমস্ত উপাদানসমূহ কোনো ব্যক্তির বা সংস্থার কার্যাবলি সম্পর্কেও ধারণা প্রদান করতে সাহায্য করে। ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে মহাফেজখানা নানা সময় প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাদানসমূহের সরবরাহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভি. এইচ. গ্যালব্রেইথ 'An Introduction to the Public Records' গ্রন্থে মহাফেজখানাকে 'the accumulated experience' বলে উল্লেখ করেছেন, যার দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মহাফেজখানা প্রকৃতপক্ষে একটি তথ্যভান্ডার যা মানুষের নিয়মিত সামাজিক, প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, আইনগত বা অন্যান্য নানাবিধ কার্যাবলীর মধ্যে স্বতঃই নির্মিত হয়ে চলে। তবে সাধারণভাবে মহাফেজখানার জন্য সেই ধরনের তথ্যই সংরক্ষণ করা হয় যেগুলির সামাজিক, ঐতিহাসিক বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, আছে বা থাকবে বলে মনে করা হয়।

মহাফেজখানার শ্রেণীবিভাগ :->

ঐতিহাসিক, সাংবাদিক বা প্রত্নতত্ত্ববিদ, আইনবিদ, বংশতত্ত্ববিদ, চিত্রনির্মাতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের গবেষকগণ সাধারণভাবে গবেষণাতে উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য মহাফেজখানা ব্যবহার করেন। এক এক ধরনের মহাফেজখানায় এক এক ধরনের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যাতে নির্ভর করে সেই সংস্থার উপর যারা যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে ভিত্তি করে সংরক্ষণাগার গড়ে তোলেন, সেটির উপর। মহাফেজখানা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। মাইকেল কুকের মহাফেজখানার সংরক্ষণের পদ্ধতি সহায়ে ভিত্তিতে মহাফেজখানাগুলিকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। মহাফেজখানাগুলিকে কেন্দ্র করে যে ধরনের অনুসন্ধান চলে সেগুলিকে আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। — [illegible]

উপাদানসমূহের সংগঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, আন্তসম্পর্কিত জটিল প্রতিষ্ঠানের সংস্থাগুলি অন্যান্য সম্পর্কিত এবং অন্যান্য অসম্পর্কযুক্ত হতে বিষয় বিষয়ের পরিচালিত হতে পারে। নীচে বিভিন্ন ধরনের মহাফেজখানা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১) শিক্ষা সংশ্লিষ্ট মহাফেজখানা :-> কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরনের মহাফেজখানার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এগুলি মূলত গ্রন্থাগারের সাথে এবং এগুলির পরিচালনা করেন একজন রক্ষক। শিক্ষা সংক্রান্ত মহাফেজখানাগুলিতে মূলত সেই সংস্থার প্রশাসনিক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের পেপারসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানের স্মরণীয় কার্যাবলী এবং কীর্তি সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। পাঠক-অনুমতি সাপেক্ষে এই ধরনের মহাফেজখানার তথ্যগুলি ব্যবহার করা যায়। সাধারণ ছাত্ররা ছাড়াও গবেষক এবং কৌতূহলী ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সাপেক্ষে প্রতি ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত মহাফেজখানাগুলি সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রদের কার্যাবলী দ্বারাও অনেকাংশে সমৃদ্ধ হয়।

২) বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট মহাফেজখানা :-> বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত সংস্থাগুলিতে অনেক সময় নিজস্ব সংরক্ষণাগার বা মহাফেজখানা গড়ে তোলা হয়। বহুজাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা কোকা-কোলা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থার নিজস্ব একটি মহাফেজখানা গড়ে তুলেছে যেটি Board of Coca-Cola নামে পরিচিত। প্রোক্টর এন্ড গ্যাম্বেল, মোটোরোলা প্রভৃতি বাণিজ্যিক সংস্থা এইরূপ নিজস্ব মহাফেজখানা চালু করেছে। এইসব বহুজাতিক মহাফেজখানাগুলিতে প্রতিষ্ঠানের সংস্থা প্রশাসন পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসা সংক্রান্ত ইতিহাস সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। বহুজাতিক সংস্থার এই ধরনের মহাফেজখানাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য নিজ সংস্থা সম্পর্কে তথ্যসমূহকে সংহত রূপ দান করা, এগুলি সংস্থার ঐতিহ্য সম্পর্কে কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা জাগায়। কোন ধরনের তথ্য কিভাবে সংরক্ষণ করা হবে সেসম্পর্কে সংস্থাটি নিজ উদ্দেশ্য ও সামর্থ্য দ্বারা নীতি গ্রহণ করে।

৩) সরকারি মহাফেজখানা :-> রাষ্ট্রীয় মহাফেজখানার পাশাপাশি রাজ্য সরকার বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মহাফেজখানাগুলিকে সরকারি মহাফেজখানার শ্রেণীভুক্ত করে বিবেচনা করা হয়। ঐতিহাসিক, গবেষক, ছাত্র ছাত্র সাংবাদিক, জনতত্ত্ববিদ, লেখক প্রমুখ যেকোনো নাগরিক আগ্রহী এইরূপ মহাফেজখানা ব্যবহার করতে পারেন। অধিকাংশ সরকারি মহাফেজখানাই জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকে এবং এগুলি ব্যবহারের জন্য কোনো পাঠক-অনুমতির প্রয়োজন থাকে না।

দের জাতীয় মহাফেজখানা গবেষক ও প্রশাসকদের ব্যবহারের জন্য হিসেবে কাজ করে এবং প্রশাসনিক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করে। ১৮৯১ সালে ইম্পেরিয়াল রেকর্ড দপ্তর কলকাতায় এই স্থান গঠন করেছিল। বর্তমানে এটি দিল্লির জনপথ এবং রাজপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে রয়েছে। এছাড়াও ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, আসাম, া, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি বেশিরভাগ রাজ্যের অধীনে িতি করে সরকারি মহাফেজখানা রয়েছে। এগুলির মধ্যে চেয়ে পুরাতন বিহার রাজ্য মহাফেজখানা, পাটনা। ন্যাশনাল ল্ম আর্কাইভ, ন্যাশনাল মিশন ফর ম্যানুস্ক্রিপ্টস আরো এই ধরনের সরকারি মহাফেজখানার উদাহরণ।

অবাণিজ্যিক মহাফেজখানাগুলি গড়ে ওঠে মূলত সংস্থাগত ও ব্যক্তিগত মূলধন ও উদ্যোগের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের মহাফেজখানাগুলি অনেক সময় অবশ্য সরকারি অনুদান লাভ করে থাকে। কোনো একটি শহরের একটি ঐতিহাসিক গবেষণা সংস্থা একটি নিজস্ব মহাফেজখানা গড়ে তুলতে পারে। কোনো কোনো কোনো লাভ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যেমন হাসপাতাল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদের সংরক্ষণের দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিবিধ মহাফেজখানা:- কোনো কোনো মহাফেজখানাকে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন উপজাতিদের নিজস্ব সংগ্রহশালাগুলি অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত মহাফেজখানাগুলির উল্লেখ করা যায়। [illegible] ফিলাডেলফিয়ায় অনেকসময় সংরক্ষিত পুরাবস্তুগুলির উপরে র বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি সহায়ক মহাফেজখানা গড়ে তোলে।

• [illegible] বিশেষ ধরনের মহাফেজখানাগুলি এক ধরনের দলিলের সাক্ষ্য জমা রাখে। যা কোনো ঐতিহাসিক মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের জন্য গড়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালিফোর্নিয়ার জাতীয় জেলখানা ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলবন্দী মহিলাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য একটি মহাফেজখানা ব্যবহার করার উদ্যোগ রয়েছে।

ব্যক্তিগত বা কোনো সংস্থার উদ্যোগে গড়ে ওঠা মহাফেজখানায় চিঠিপত্র, দলিলপত্র, বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র, ফাইল, বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য, আলোচনার মিনিটস প্রভৃতি ডিজিটাল বা অডিও-ভিজুয়াল

...া সংরক্ষণ করা হয়। অনেক বিদেশি অতীত ও বিখ্যাত চার্চের সাথেও ...তি মহাফেজখানা সংযুক্ত থাকে। উদাহরণ হিসেবে ভ্যাটিকান ...ান মহাফেজখানার উল্লেখ করা যায়; তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতির ...র সাথে 'ওয়েব আর্কাইভ' প্রক্রিয়া জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এতে ...ন্ত ওয়েব' ব্যবহার করে বিভিন্ন নথিপত্র সংগ্রহ করে এগুলি ...মহাফেজখানায় সংরক্ষণ করা হয় এবং এগুলি 'আর্কাইভ সাইট' ...ে রাখা হয়। গবেষক, ঐতিহাসিক ও সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে ওয়েব আর্কাইভের থেকে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারেন।

মহাফেজখানার নথিপত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

সাধারণভাবে বলা হয়, প্রাচীনকালে নথি বা দলিলপত্রই আর্কাইভ ...খ্যাত হয়। বিখ্যাত সমাজ মানুষের প্রয়োজনে যে নথি লাগে ...র নাম 'আর্কাইভস', কোনো রেকর্ড যখন স্থায়ীত্ব বা সংর... ...ের উপযোগিতে উন্নীত হয় তখন তা আর্কাইভস'-র মর্যাদা লাভ করে।

নিরপেক্ষতা :-> মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নথিপত্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য ...ল তার নিরপেক্ষতা। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের ইচ্ছামতো ...া নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোনো নথি ...রি করলে তা মহাফেজখানায় সংরক্ষিত হয় না। যেহেতু দেশ ...শাসন ও প্রশাসনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে যে নথি তৈরি করা ...হয় তা মহাফেজখানায় সংরক্ষণ করা হয়, তাই এইসমস্ত ...নথি দলিল তথ্যের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ...কোনো অবকাশ থাকে না। একারণেই ইতিহাসের স্বীকৃত ...তথ্য হিসেবে মহাফেজখানার নথিপত্রের মূল্য ~~নির্ভরতা~~ ...দীর্ঘ সময়কাল ধরে অটুট থাকে। সমাজবিজ্ঞানী একথা ...স্বীকার করেন যে "...they cannot ~~tell~~ him but the truth".

...) নির্ভরযোগ্যতা :-> মহাফেজখানার নথিপত্র যেহেতু নিরপেক্ষ এবং অকৃত্রিম, তাই এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এর নির্ভরযোগ্যতা। যারা এই নথিপত্র ...তৈরি করেন তারাই এর নির্ভরযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন। তাঁরা এই নথিপত্রের মৌলিকত্ব বজায় রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকেন। যেহেতু মহাফেজখানায় সংরক্ষিত কোনো নথির কোনো অংশ ...পরবর্তীকালে কোনো কারণেই হেরফেরও ঘটানো যায় না, ...এই কারণে দেশের নিম্নতম আদালত থেকে দেশের সর্বোচ্চ

কাল ও পর্যন্ত তা দ্বিধাহীনভাবে নির্ভরযোগ্য তথ্য হিসাবেই গ্রহণ করা হয়। এই হেতু মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজের প্রামাণিকতা (ও ঐতিহাসিক মূল্য) দুটিই নির্ভরযোগ্য, তাই এগুলি নির্ভরযোগ্যতায় প্রশ্ন তোলা হয় না। প্রশাসক ও ঐতিহাসিকদের কাছে মহাফেজখানার নথির প্রাপ্ত তথ্য তাই নিখুঁত, সত্য, অবিকৃত ও অকৃত্রিম বলে বিবেচনা করা হয়।

মৌলিকত্ব :- মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নথিপত্রের মৌলিকত্ব এর তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্যতিক্রম হিসেবে কখনো কখনো নথিপত্রের স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে এগুলির মৌলিকত্ব নষ্ট করার চেষ্টা হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে মহাফেজখানায় সংরক্ষিত নথিপত্রের আদি ও অকৃত্রিম বলে গণ্য করা হয়। এগুলির মৌলিকত্বই এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য বৃদ্ধি করে।

অনন্যতা :- মহাফেজখানা ও স্থায়ী নথিপত্রের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য অনন্যতা। মহাফেজখানায় যে ঘটনা যে নথিতে যেভাবে উল্লেখিত হয় তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। একই ঘটনার যেমন পুনরাবৃত্তি ঘটে না, তেমনি নথিরও পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। এ কারণে মহাফেজখানার নথিপত্র অন্যান্য নথিপত্র থেকে পৃথক এবং অনন্য।

৪

Sabang Sajanikanta Mahavidyalaya ✻ Dalkhola Netaji Centenary College ✻

Internal Assessment :- 2022-23

Student Name:- Tapas Bauri.

User Id :- 2119II04018

Course Id :- 40405

Course code :- AH/HST/405/SEC-2

Course Title :- Understanding Popular Culture

Semester :- 4th

Mobile NO:- 8609692318

Subject :- SEC-2

Date:- 24/05/23

(10)

প্রজেক্টের বিষয়:

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরের স্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

ভূমিকা:- পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ ছিল প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুর। মল্ল রাজ্য আজকের বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মল্লরাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এবং সেই সময় থেকে বিষ্ণুপুরে একের পর এক টেরাকোটা মন্দির গড়ে ওঠে। এই কারণে বিষ্ণুপুর মন্দির নগরী নামে পরিচিত। রাঢ় বাংলার মন্দিরগুলিকে 4টি ভাগে ভাগ করা যায়— চালা, রত্ন, চাঁদনী, দালান। চালার মধ্যে একটি মাত্র চালযুক্ত মন্দিরকে একচালা, দুটি চালযুক্ত মন্দিরকে দোচালা বা এক বাংলা। দুটি দোচালাকে সামনে পিছনে যুক্ত করে জোড় বাংলা, চারদিকের চাল নিয়ে চার চালা, চারচালার উপর আরো চাল বসিয়ে আটচালা ও বারোচালা পর্যন্ত মন্দির নির্মাণ রীতি লক্ষ্য করা যায়। চাঁদনী ও দালানের ছাদ সমতল হয়। চালা- চাঁদনী বা দালানের ছাদে ছোট আকারের দেউলকে চূড়া বা রত্নরূপে বসিয়ে একরত্ন, পঞ্চরত্ন, ত্রয়োদশ রত্ন, একবিংশতি ও পঞ্চবিংশতি মন্দির নির্মিত হয়। প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যের দিক থেকে রাসমঞ্চ ও মোরেশ্বর মন্দির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রচুর টেরাকোটা, মাকড়া পাথর ও ঝামা পাথর দিয়ে মন্দিরগুলি নির্মিত। টেরাকোটার আশ্চর্য ও উৎকৃষ্ট অলংকারের জন্য বিষ্ণুপুরের ইটের মন্দিরগুলি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

অনুশীলন ক্ষেত্রে রাঢ়:- রাঢ়বঙ্গের সীমানা বিশাল ও বৃহৎ। রাঢ়বঙ্গের উত্তরদিকে রয়েছে বীরভূম, দক্ষিণ- পশ্চিমদিকে রয়েছে মেদিনীপুর, পূর্বদিকে রয়েছে বর্ধমান ও হুগলি এবং পশ্চিমদিকে পুরুলিয়া। ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা রুক্ষ প্রকৃতির হলে কি হবে লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের অফুরন্ত ভান্ডার রয়েছে ঐ জেলার মধ্যে। লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের একটি অংশ হল টেরাকোটা মন্দির- স্থাপত্য। আর এই মন্দিরগুলি আমরা বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার নানান স্থানে দেখতে পাই।

রাঢ়ের ঐতিহাসিক পরিচয়:- বঙ্গদেশের একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীন জনপদ হল রাঢ়। এই রাঢ় শব্দটি একটি প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত শব্দ। ভারতবর্ষের বহু জায়গাতেই ঐ রাঢ় শব্দটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। রাঢ় নামক শব্দটি বেদ, পুরাণ, বিভিন্ন উপাখ্যান প্রাচীন সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য বিভিন্ন পুঁথি প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্নভাবে পেয়ে থাকি।

রাঢ়বঙ্গের ঐতিহাসিক পরিচয়, নামকরণ, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, তাৎপর্য প্রভৃতি নিয়ে মত ভেদের শেষ নেই -। বিভিন্ন পন্ডিত, ইতিহাসবিদ ও গবেষকেরা রাঢ় নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন -। আবার অনেকে সেই সব মতের পাল্টা বিপরীত মতও প্রকাশ করেছেন।

ভৌগোলিক পরিচয়ঃ- রাঢ়ভূম রুক্ষ শুষ্ক ও লাল মাটির দেশ; এর চারিদিকে বেষ্টন করে আছে ঝংরি- দারাং এর ঝোপঝাড়, বন-জঙ্গল, টিলা মালভূমি, পাহাড়, খাদ প্রভৃতি -। শুশুনিয়া, মামাক, অযোধ্যা, পঞ্চকোট প্রভৃতি পাহাড় এবং দামোদর- দ্বারকেশ্বর, কাঁসাই, শিলাই, ময়ূরাক্ষী, অজয়, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদী এবং বাবলা, কেঁদ, শিয়াকুল প্রভৃতি ঝোপ -। ধূ ধূ করা মাঠ, প্রচুর চাষযোগ্য জমি কিন্তু এক অংশে ভালো ফসল উৎপন্ন হয় আর এক অংশে ফসল সেভাবে জন্মায় না -। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে রূপান্তরিত বেলে পাথর, পাললিক শিলা, গ্রানাইট, গ্রাফাইট, ক্লে আয়রণ, ল্যাটেরাইট শিলা, স্লেট পাথর -।

আর্থ- সামাজিক- সাংস্কৃতিক পরিচয়ঃ- লাল মাটির দেশ রাঢ়বঙ্গে বসবাস করে সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, মাহালি, ডোম, বাগদি, মুচি, হাড়ি ইত্যাদি জাতি ও উপজাতির মানুষ -। এছাড়া রয়েছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, কামার, ছুতোর, তাঁতি প্রভৃতিরাও -। এই অঞ্চল ঝুমুর, টুসুগান, ভাদুগান, পাতানাচ, কাঠিনাচ, করম, বাঁদনা, বাহা প্রভৃতি উৎসব, ছড়া, ধাঁধা, লোককথা, প্রবাদ- প্রবচন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানে সমৃদ্ধ -। এছাড়া এই অঞ্চল মৃৎশিল্প, শঙ্খশিল্প, তাঁতশিল্প, কাঁসা- পিতল শিল্প, লৌকিক চিত্রকলা প্রভৃতি অনুপম শৈল্পিক চেতনার পরিচয়বাহী -।

রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহ্য ও রীতিঃ- পশ্চিমবঙ্গের টেরাকোটা মন্দির- স্থাপত্যের যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে রাঢ়ের মন্দির স্থাপত্যের স্থাপত্যকলার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে -। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলন বা সমন্বয় রাঢ়ের রীতি ও শৈলীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় -। রাঢ় বাংলার অঞ্চলগুলিতে চালা, মঞ্চ, রত্ন, সমতল ছাদ, দালান প্রভৃতি রীতির মন্দির চোখে পড়ে -। এইসব মন্দিরগুলির গায়ে পোড়ামাটির সুন্দর- সুন্দর মূর্তি রয়েছে যা আজও বিস্ময় হয়ে রয়েছে -। শুধুমাত্র ধর্মচর্চার স্থান হিসেবে নয়, এই সব অঞ্চলের স্থান বিশেষের মন্দিরগুলি থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে মৌলিক উপাদান সংগৃহীত হতে পারে গভীর অনুসন্ধানের দ্বারা তা বোঝা যায় -। রাঢ় বাংলা নদী মাতৃক অঞ্চল, নদীর পলিমাটি দিয়ে গড়া বিস্তীর্ণ স্থানসমূহ দোচালা

চারচালা, জোড়বাংলা, আটচালা, চাঁদনী, একরত্ন, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, ত্রয়োদশ রত্ন, সপ্তদশরত্ন, পঞ্চবিংশতিরত্ন প্রভৃতি বাংলা রীতির বেশ কিছু মন্দির দেখা যায় -। এই ধরনের মন্দিরগুলি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায় -। তবে এই সমস্ত স্থানে চালা, চাঁদনী ও রত্ন মন্দিরের আধিক্যই বেশি -।

❀ বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরের কয়েকটি স্থাপত্য শৈলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

i) একরত্ন রীতির মন্দির :- মল্লরাজ দুর্জন সিংহ 1694 খ্রী. একরত্ন বা মদন-মোহন মন্দির নির্মাণ করেন -। মাকড়া পাথরের ভিতের উপরে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি পূর্ব- পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে ত্রি- খিলানযুক্ত দালান রয়েছে -। মন্দিরটি টেরাকোটার অলংকরণে সজ্জিত -। রাম-রাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশাবতার, কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন ঘটনা, নারীর কাপড় কাচার দৃশ্য নারী-পুরুষের ঢোল নিয়ে নাচ, নাম- সংকীর্তন দৃশ্য, যুদ্ধযাত্রা, বাঘ-মানুষের লড়াই প্রভৃতি ফলক ব্যবহার করা হয়েছে -।

চিত্র নং-২ একরত্ন রীতির মন্দির

একরত্ন রীতির মন্দির

ii) জোড় বাংলা রীতির মন্দির :- রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক নির্মিত জোড় বাংলা বা কেষ্টরায় মন্দিরটি পোড়ামাটির শিল্পে অন্যতম শ্রেষ্ঠ -। মাকড়া পাথরের ভিত-ভিতের উপর দুটি দোচালা ভিতের মন্দিরকে পাশাপাশি বসিয়ে তার ওপরে একটি চারচালা রীতির মন্দিরকে বসানো হয়েছে -। এবং - পোড়ামাটির অলংকৃত টালি মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করা হয়েছে -।

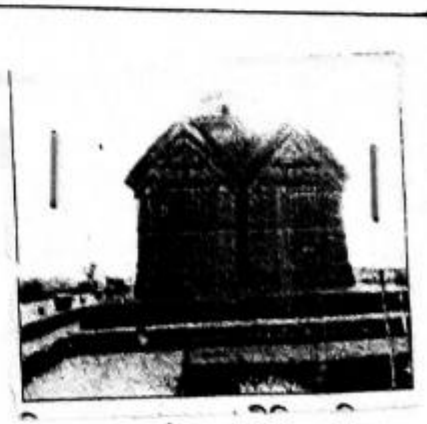

জোড় বাংলা রীতির মন্দির

iii) **পঞ্চরত্ন রীতির মন্দির :-** 1643 খ্রিস্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক নির্মিত পঞ্চরত্ন বা শ্যামরায় মন্দিরটিতে পাঁচ ধরনের পাঁচটি চূড়া রয়েছে -। মন্দির জুড়ে রয়েছে টেরাকোটার ফলক, দক্ষিণ দিকে রয়েছে তিনটি খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা -। ওই মন্দিরের বাইরের দেয়ালও হিন্দু মহাকাব্য ও রাধাকৃষ্ণের জীবনগাঁথা অবলম্বনে পোড়ামাটির ফলকে — অলংকৃত হয়েছে -।

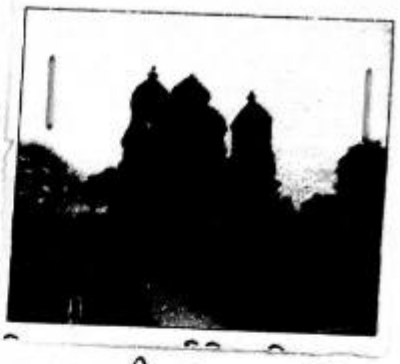

পঞ্চরত্ন রীতির মন্দির

iv) **দেউল রীতির মন্দির :-** বাংলার সবচেয়ে আগের মন্দিরগুলোর মধ্যে দেউল অন্যতম -। খ্রিস্টীয় মধ্যশতক থেকে দেউল শিল্পরীতির বিকাশ ঘটে -। এরপর মুসলিম শাসনের পর অন্ত-মধ্য যুগে বাংলায় দেউল শিল্পে এক নবজাগরণ আসে -। বাংলায় চালা শিল্পরীতি স্থানীয় মানুষের আপন হলেও পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ১৬ শতকের মধ্যে দেউল স্থাপত্য রীতির প্রভূত উন্নতি হয় -।

দেউল রীতির মন্দির

v) **চালা রীতির মন্দির :-** চালা শিল্পরীতির বাংলার সমাজজীবনের প্রতিফলন দেখা যায় -। এটি খড়ের চালা দাওয়া মাটির ঘরের আদলে তৈরি -। ওই শিল্পরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য চালার বাঁকানো ক শীর্ষ ও কার্নিশ -। রত্ন মন্দির চালা মন্দিরের একটি সম্প্রসারিত শিল্পরীতি -। চালা শিল্পরীতির মন্দিরের উপর চূড়া বসানো থাকলে তখন তাকে রত্ন মন্দির বলা হয় -।

চিত্র নং-১ চালা রীতির মন্দির

একচালা রীতির মন্দির

● **গবেষণা ও বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষামূলক স্থান :-** সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যেমন- আবহাওয়া, সংস্কৃতি, অর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি। এই অঞ্চলে বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য বিষয়ক গবেষণার আদর্শ ক্ষেত্র। এছাড়াও রাঢ়বঙ্গে অবস্থিত মন্দির গুলির মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার দেশীয় ও ঐতিহাসিক মন্দির-স্থাপত্যের অবস্থান ধারণা পাওয়া যায়।

● **উপসংহার :-** পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভরা একটি অঞ্চল। ঐতিহাসিক গবেষকরা তাই রাঢ়ভূমকে 'মন্দিরের জন্মভূমি' নামে আখ্যায়িত করেছেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য। এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বেশকিছু মন্দির ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র National Heritage-র মর্যাদা পেয়েছে।

10

Date:- 24.05.2023

Signature of teacher: Mritunjoy Sarkar

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

NAME: MANIKA MANDAL Roll NO: 111

SEMESTER- IV (4th) SUBJECT - HISTORY HONS

COURSE ID: 40405 COURSE CODE: AH/HST/405/SEC-3

COURSE TITLE: UNDERSTANDING POPULAR CULTURE

VID NO: 2119104021 Date- 24.05.2023

10

রাঢ়ে টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ও মূল্য

ভূমিকা: বাংলার এক সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদ হল রাঢ় অঞ্চল বা রাঢ়বাংলা। এই রাঢ়বাংলার অন্তর্ভুক্ত হল বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি ও মুর্শিদাবাদের কিছু স্থান। ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যে রাঢ়বাংলার মন্দির-স্থাপত্য যথেষ্ট গৌরবময় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের অসাধারণ নিদর্শন এই রাঢ়বাংলার বিভিন্ন জেলার মন্দির-স্থাপত্যের মধ্যে দেখা যায়। এই অঞ্চলে বিভিন্ন রীতির ও শৈলীর টেরাকোটা মন্দির-স্থাপত্য দেখা যায়, অলংকরণ শৈলী সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে এক নিখুঁত চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। এখানে চালা, রত্ন, চাঁদনী, দালান প্রভৃতি রীতির মন্দির-স্থাপত্যের গায়ে সামাজিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি কাহিনির চিত্র-ফলক শুধুমাত্র তৎকালীন সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের পরিচয় করায় না বরং সঙ্গে সঙ্গে আমরা মন্দিরের নান্দনিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারি।

অনুশীলন ক্ষেত্র হিসাবে রাঢ়: রাঢ়বঙ্গের সীমানা বিশাল ও বৃহৎ। রাঢ় বঙ্গের উত্তরদিকে রয়েছে বীরভূম, দক্ষিণ পশ্চিমদিকে রয়েছে মেদিনীপুর, পূর্বদিকে রয়েছে বর্ধমান ও হুগলি এবং পশ্চিমদিকে পুরুলিয়া। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা রুক্ষ হলে কী হবে লোকসংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এই জেলার মধ্যে। লোকসংস্কৃতি ও প্রত্নতত্ত্বের একটি অঙ্গ হল টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য। তাই এই মন্দিরগুলি আমরা বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, ~~সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও শিল্পগত~~ মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার নানান স্থানে দেখতে পাই।

রাঢ়ের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিচয়:-

রাঢ়বঙ্গে নানা জাতি ও উপজাতির মানুষের বসবাস রয়েছে। রাঢ়বঙ্গ রুক্ষ, শুষ্ক, অনুর্বর ও কাঁকরময়। তাই স্বাভাবিকভাবেই এখানকার লোকজনদের কঠোর পরিশ্রম করে জীবনযাপন করতে হয়। তা সত্ত্বেও এখানকার মানুষজনদের মধ্যে আবেগ ও অনুভূতির কমতি নেই। এই রাঢ় বঙ্গে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। এর সাথেই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব রাঢ়ের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রসঙ্গে।

ঐতিহাসিক পরিচয়: প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে (প্রাচীনকাল) এ অঞ্চলের প্রাচীন জনপদ হল রাঢ়। এই রাঢ় অঞ্চলটি একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে পরিচিত। ভারতবর্ষের বহু জায়গার মত এখানেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রাচীনকালের মুদ্রা, পুরাণ, বিভিন্ন শিলালেখ, প্রাচীন মন্দির, মাটির কাজ, বিভিন্ন মূর্তি প্রভৃতি থেকে গবেষকেরা জেনেছেন। বিভিন্ন পণ্ডিত, ঐতিহাসিকগণও এ অঞ্চল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। আবার অনেকে এর ভিন্ন মতের পাল্টা বিপরীত মতও প্রকাশ করেছেন।

ভৌগোলিক পরিচয়: রাঢ়বঙ্গের অন্তর্গত লালমাটির দেশ; এর চারিদিকে রয়েছে ছোট বড় মুকুট — পাহাড় এর পাদদেশ, ঘন জঙ্গল, টিলাময় খড়ি পাহাড়, ধারা প্রভৃতি। শুশুনিয়া, মুকুটমণিপুর, পঞ্চকোট প্রভৃতি পাহাড় এবং দামোদর - দ্বারকেশ্বর, কাঁসাই, শিলাই, গন্ধেশ্বরী, জয়পুর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদী এবং জঙ্গল, কেঁদ, কিয়াকুল প্রভৃতি ঝোপ। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে কালাপাথর, চীনামাটি, খনিজ, কয়লা, চুনাপাথর, ল্যাটেরাইট মাটি, সেল পাথর ইত্যাদি।

আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়: লালমাটির দেশ রাঢ়বঙ্গে বসবাস করে সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, মাহালি, ভোমজ, বাগদি, মুচি, কুঁড়ি ইত্যাদি জাতি ও উপজাতির মানুষ। এছাড়া রয়েছে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কামার, কুমোর, তাঁতি প্রভৃতিরাও। এই অঞ্চল ঝুমুর, টুসুগান, ভাদুগান, পাতানাচ, কাঠিনাচ, করম, বাঁধনা, যাত্রা প্রভৃতি উৎসব মেলা, ধাঁধা, লোককথা, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানে সমৃদ্ধ। এখানেই অঞ্চলে শঙ্খশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, তাঁত শিল্প। কাঁসা-পিতল শিল্প, লৌকিক চিত্রকলা প্রভৃতি এর অর্থনৈতিক চেতনার পরিচয়বাহী।

রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের ঐতিহ্য ও রীতি: পশ্চিমবঙ্গের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে রাঢ়ের মন্দির-স্থাপত্যকলার একটি বিশেষ ধারা রয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির মিলন যা অনন্য রাঢ়ের রীতি ও শৈলীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রাঢ় বাংলার অঞ্চলগুলিতে চালা, মঞ্চ, রত্ন, সমতল ছাদ, দালান প্রভৃতি রীতির মন্দির চোখে পড়ে। এইসব মন্দিরগুলির গায়ে পোড়ামাটির সুন্দর সুন্দর মূর্তি রয়েছে যা আজও বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। এই রীতির মন্দিরগুলি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর

বর্ধমান, হুগলি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা যায়। তবে এই সমস্ত স্থানে চালা, চাঁদনি ও রত্ন মন্দিরের আধিক্যই বেশি।

চিত্র নং-১ চালা রীতির মন্দির

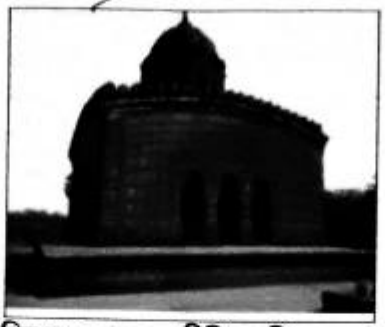

চিত্র নং-২ একরত্ন রীতির মন্দির

চিত্র নং-৩ সমতল ছাদের মন্দির

চিত্র নং-৪ জোড়বাংলা রীতির মন্দির

চিত্র নং-৫ দেউল রীতির মন্দির

চিত্র নং-৬ পঞ্চরত্ন রীতির মন্দির

অলংকরণ শৈলী : মন্দির হল হিন্দুধর্মে আরাধনা স্থান তথা প্রার্থনা গৃহ। তাই মন্দিরকে বলা হয় স্থাপত্য ও শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ। এই মন্দিরগুলি এক সময় রাজা, জমিদার বা বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। বাড়গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যগুলিকেও আমরা স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন হিসাবে বলতে পারি। মন্দিরগুলির অলংকরণ কোন সমকালীন শিল্পীদের স্থাপত্য চিন্তাও কিন্তু বেশির ভাগ বহন করছে। টেরাকোটা ফলকগুলি অলংকরণ মাধ্যমে নানা দিক থেকে সৌন্দর্য বর্ধন করা সম্ভবপর হয়েছে।

গুলির আকৃতি বর্গাকার, আয়তকার, ত্রিকোণ, এবং গোলাকার হয়ে থাকে। এছাড়া মানুষ, জীবজন্তু, ফুল-ফল ইত্যাদি আকৃতি অনুসারে ফলকের আকার পরিলক্ষিত হয়। ফলকের মাপও বিভিন্ন রকমের। যেমন- ১৮×১২ ইঞ্চি, ১৫×১২ ইঞ্চি, ১৫×৬ ইঞ্চি, ১২×৮ ইঞ্চি, ১০×৮ ইঞ্চি, ৬×৬ ইঞ্চি, ৪×৪ ইঞ্চি ইত্যাদি

স্বকীয়তা: ঝাড়গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের যেসব স্বকীয়তার দিক গুলি রয়েছে সেগুলি হল-

প্রথমত: ঝাড়গ্রামে বিভিন্ন রীতি ও শৈলীর টেরাকোটা মন্দির দেখা যায়।

দ্বিতীয়ত: এখানকার বেশিরভাগ মন্দিরই অন্ত-মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়ত: এই অঞ্চলের মন্দিরগুলি রাজা, জমিদার ও বিত্তবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল।

চতুর্থত: মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় মানুষেরা সেরকম কোনো তথ্য দিতে পারেনি।

পঞ্চমত: এখানকার মন্দিরগুলিতে শিব, দুর্গা, রাধা কৃষ্ণ, কালী, নারায়ণের পূজা হয়।

ষষ্ঠত: বেশিরভাগ মন্দিরের চূড়ায় বজ্রদণ্ড ও ত্রিশূল দেখা যায়।

সপ্তমত: এখানকার মন্দিরগুলিতে পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের ফলক দেখা যায়।

অষ্টমত: পুরাকীর্তি সম্বলিত সম্পদগুলিকে দেখার উদ্দেশ্যে বহু দর্শক, পর্যটক, গবেষক, ঝাড়গ্রামে পর্যটনের উদ্দেশ্যে আসে।

ঝাড়গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের সামাজিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য:

অন্ত-মধ্যযুগে রাজা, বিত্তবান ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঝাড়গ্রামের বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার টেরাকোটা মন্দির নির্মিত হয়েছে কিন্তু অতিবাহিত সময়ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক স্থাপত্য ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমান মন্দির স্থাপত্যগুলি সমাজের নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী দিয়ে আজও টিকে রয়েছে যা থেকে আমরা অতীত সংস্কৃতির তাৎপর্য ও ঐতিহ্যের বিষয়ে পরিচয় লাভ করতে পারি।

মূল্য: রাঢ়বাংলার একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান ও প্রাচীন জনপদ তাই এর value বা মূল্যকে কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না। মূল্য সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল এবং সমাজের উপর নির্ভরশীল। রাঢ়বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যগুলিকে কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। নিম্নে পর্যায়ক্রমে এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হল।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য: রাঢ়বঙ্গ তথা অন্ত-মধ্যযুগ থেকে কয়েক হাজার টেরাকোটার মন্দির সংরক্ষণ করে আসছে। এইসব টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যগুলি সমকালীন সময়ের বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক পরিস্থিতি সব কিছুর সাক্ষী বহন করে নিয়ে চলেছে। এছাড়া এই স্থাপত্য কীর্তিগুলি তৎকালীন সময়কার বিভিন্ন রাজা, জমিদারদের অর্থ-সামাজিক জীবন সম্পর্কে পরিচয় দেয়। এই স্থাপত্য কীর্তিগুলি তৎকালীন-উনিশ শতকের ধর্মীয় অবস্থা ও রীতিনীতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান প্রদান করে। মন্দিরের ওপর ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপিতে খোদিত লিপিগুলি শুধুমাত্র মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়কেই উল্লেখ করে না; সেই সময়কার বাংলার বিভিন্ন লিপি ও বর্ণ সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করে।

শৈল্পিক এবং নান্দনিক মূল্য: রাঢ়ের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যে অবস্থিত উচ্চ মানের টেরাকোটা ফলকের মাধ্যমে শৈল্পিক ও নান্দনিক মূল্য ফুটে উঠেছে। রাঢ়ের বিভিন্ন স্থানের টেরাকোটা মন্দির অলংকরণ স্থাপত্যকলা দেখলে বোঝা যায় বাংলার অন্ত-মধ্যযুগীয় সময়েও টেরাকোটা শিল্প অব্যাহত ছিল। পোড়ামাটির ফলকের উপর খোদিত বিভিন্ন দৃশ্য। মন্দিরের সামনে, পিছনে, পাশে, পার্শ্বে নানা বিভিন্ন দিক থেকে ফলকের প্রতিস্থাপন করেছেন শিল্পীরা, যা থেকে বোঝা যায় অনেক উচ্চ বিকাশ করে ফলকগুলিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
ছোট বড় প্রতিটি বিভিন্ন রঙের ফলকে আমরা বিভিন্ন ঘটনার সমাহার দেখতে পাই। একঘেয়েমি ভাবনার হাত থেকে দর্শকদের চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য প্যানেলগুলির ফাঁকে ফাঁকে শিল্পীরা ফুল, লতা, পাতা ও জ্যামিতিক নকশার চিত্র ব্যবহার করেছিলেন।

ধর্মীয় আধ্যাত্মিক মূল্য: প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বহু মানুষের জন সমাজে ও বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে এখানকার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। পূর্বে এখানকার প্রায় সব মন্দিরেই পূজা করা হত কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু মন্দিরে পূজা হয় না কারণ সেগুলি ভারত সরকার দ্বারা National Heritage-এর মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাতে শিব, কালী, দুর্গা, নারায়ণ প্রভৃতি দেব-দেবীদের মন্দির দেখা যায়। তবে সব মধ্যে শিবের মন্দিরের সংখ্যার সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিব মন্দিরের উদাহরণ হল অম্বিকা-কালনার ১০৮ শিব মন্দির, বর্ধমানের ১০৮ শিব মন্দির, বিষ্ণুপুরে জোড় বাংলা শিব মন্দির, মুর্শিদাবাদের চারবাংলা ও বড়নগরের শিব মন্দির, বিষ্ণুপুরের [illegible] শিব মন্দির ইত্যাদি। কিন্তু মন্দিরের নিত্য পূজা হয় আবার কিছু কিছু মন্দিরে বিশেষ তিথিতে পূজা করা হয়।

চিত্র নং-৭ ত্রিমাত্রিক ফলক

চিত্র নং-৮ নবনারীকুঞ্জ

চিত্র নং-৯ রাসমণ্ডল

Volume- V, Issue-IV April 2017

ধর্মীয় সামাজিক মূল্য: অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ও সামাজিক কার্যকর্ম তথা অভ্যাস আজও এই অঞ্চলে পারম্পরিকভাবে বর্তমান রয়েছে যার দরুনই অঞ্চলকে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশীলন পর্যন্ত পুরোনো প্রথা ও সম্মিলিত তথ্যের ভাণ্ডার স্বরূপ বিবেচনা করা হয়, এখানকার অধিবাসীরা আজও বাংলার নানান ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি নীতিকে ধরে রেখেছে বিলুপ্ত হতে দেয় নি। সমগ্র বাংলার

সংস্কৃতি পরিক্ষেত্রে সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়। এই অঞ্চলের ঝুমুর, টুসুগান, ভাদুগান, পাতানাচ, কাঠিনাচ, ছৌনাচ, বাঁদনা পরব, করম পরব, ছড়া, ধাঁধাঁ, লোককথা, প্রবাদ প্রবচন প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির উপাদানে সমৃদ্ধ। লোকশিল্পে সুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করে আসছে এই অঞ্চল। এই অঞ্চলের মৃৎশিল্পী, কাষ্ঠশিল্পী, তাঁত শিল্প, কাঁসা পিতল শিল্প, লৌকিক চিত্রকলা প্রভৃতি অনুপম শৈল্পিক চেতনার পরিচয়বাহী।

<u>গবেষণা ও বিদ্যায়তনিক শিক্ষাগত মূল্য:</u> সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, যেমন – স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্য, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি। এই অঞ্চল বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য বিষয়ক গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র। এছাড়াও রাঢ়বঙ্গে অবস্থিত মন্দিরগুলির মাধ্যমে তৎকালীন বাংলার দেশীয় বৈচিত্র্যময় মন্দির স্থাপত্যের এই রাঢ় ভূমিকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের দিক থেকে অনন্যতা দান করেছে।

<u>উপসংহার:</u> পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল পুরাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে ভরা একটি অঞ্চল। যথার্থ ভাবে গবেষকরা তাই রাঢ় ভূমিকে 'মন্দিরের হৃদয়ভূমি' নামে অভিহিত করেছেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য। এতো বেশি বৈচিত্র্যময় স্থান ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত বেশকিছু মন্দির সংরক্ষিত National Heritage -র মর্যাদা পেয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য হিসেবে অনেকস্থানের মন্দিরগুলি National ও World Heritage -র মর্যাদা পায় তার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে। এই অঞ্চলের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্যের সাথে লোকসংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের নিবিড় যোগ রয়েছে। তবে এই বৈচিত্র্য সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই অমূল্য সম্পদগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে — যা ভবিষ্যতের হাত থেকে রক্ষা করা খুবই প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থপঞ্জী: কোঙার, গোপীকান্ত (সম্পা:), বর্ধমান সমগ্র (চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা: দে বুক স্টোর, ২০০২।

ঘোষ, বিনয়; পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড), কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৯৮০।

ঘোষ, নীহার (অনুবাদক ঋত্বিক ঘোষ ও জীতা নিয়োগী), বাংলার মন্দির শিল্প শৈলী (অনুবাদিত গ্রন্থ), কলকাতা: ভারত ভারতী, ২০১২

ঘোষ, প্রণব, বাংলার লোকশিল্প, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৪।

দাস, সুশান্ত (সম্পা:), অম্বিকা কালনা ইতিহাস সমগ্র অম্বিকা কালনা: সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ~~কালনা~~: তট ভূমি প্রকাশনী, ২০১২।

রায়, প্রণব, বাংলার টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, মেদিনীপুর: পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, ১৯৯২।

সাঁতরা, তারাপদ, পশ্চিমবাংলার ~~[illegible]~~ ধর্মীয় স্থাপত্য মন্দির ও মসজিদ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

প্রবন্ধ - পত্রিকা:

Mandal, S.K. & T. Mukherjee. (2015). Bolpur mahakumar Mandir Sthapattya. Sahabati, 1(1), 34-50.

Mandal, S.K. & T. Mukherjee (2015) Bishnupurer ~~mandir~~ ~~Gram mallu~~ Mrinmay terracotta mandir Sthapattya: Gathan-Riti o Alongkaraner Bisay Ebong Shaili. International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies. 1(6) 49-57.

অনুসন্ধানপত্র;

মুখার্জী, তনয়া. মাকুটি গ্রামের টেরাকোটা মন্দির স্থাপত্য: একটি পুরাতাত্ত্বিক অন্বেষণ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, ২০১২।

Sign. of Student Manika Mandal
24.05.2023

Sign. of Teacher
Mritunjoy Sarkar

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

NAME-TANUSHREE THANDAR

INTERNAL ASSEMENT-GUPTA YUG & SUBARNA YUG

COLLEGE CODE-119

ROLL NO-669

UID NO- 1192200807

MOB NO- 7908939410

COURSE CODE- AH/HST/201/C-3

■ গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতের সুবর্ণ যুগ বলা কতখানি যুক্তি সঙ্গত ■

7½

ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক চরম গৌরবময় যুগ। প্রতিভাবান গুপ্ত সম্রাটদের সুশাসনে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ও আর্থিক সংবৃদ্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার এক অপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল এই কারনেই গুপ্ত যুগকে "সুবর্ণ যুগ" বলা হয়। ঐতিহাসিক বার্নেট গুপ্ত যুগকে গ্রিসের ইতিহাসের পেরিক্লিসের যুগ, রোমের ইতিহাসের অগাস্টাসের যুগ এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাসের এলিজাবেথের যুগ-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গুপ্ত যুগে উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটে। কেন্দ্রীকরন ও বিকেন্দ্রীকরন নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে গুপ্ত শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। গুপ্ত রাজারা শক শক্তির উচ্ছেদ ঘটান এবং হুন আক্রমন প্রতিহত করেন।

■ সাহিত্য

গুপ্ত যুগ সংস্কৃত সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই সময় সংস্কৃতই ছিল সাহিত্য রচনার প্রধান ভাষা। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নিজে সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। এই জন্যে তাকে কবিরাজ বলা হয়েছে। এলাহাবাদ প্রশস্তিটি সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেনের প্রতিভার প্রমান। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেন ও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নবরত্ন সভা বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুনী ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, রঘুবংশম, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, মেঘদূতম্, কুমারসম্ভবম্, ঋতুসংহার প্রভৃতি

সমুদ্রগুপ্ত

নাটক ও কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে স্থায়ী আসন দিয়েছে। এই যুগে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটি', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', ভারবি - 'কিরাতার্জুনীয়ম্', বিষ্ণুশর্মার - 'পঞ্চতন্ত্র', দন্ডীর 'দশকুমারচরিত', অমর সিংহের 'শব্দকোষ' রচিত হয়।

গুপ্ত যুগকে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র রচনার স্বর্ণযুগ বলা চলে। এই যুগে দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক মৌলিক তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। এবং বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়। 'মনুসংহিতা' এই যুগের রচনা। ১৮টি পুরান এই যুগে নবরূপে লাভ করে এবং রামায়ন ও মহাভারত এদের বর্তমান রূপ পায়। বিশিষ্ট শাস্ত্রকার ঈশ্বরকৃষ্ণ, বসুবন্ধু, আসঙ্গ, গৌরপাদ, দিগ্নাগাচার্য, এবং ব্যাকরণবিদ ভর্তৃহরি, পানিনী, পতঞ্জলি এই যুগে আবির্ভূত হন। সমুদ্রগুপ্তের বীনাবাদনরত মুদ্রাটি গুপ্ত যুগে সঙ্গীতের উন্নতির পরিচায়ক।

বিজ্ঞানচর্চা

গুপ্ত যুগে চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়ন, গণিত, ধাতুবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছিল। ধন্বন্তরি, বাগভট, সুশ্রুত প্রমুখ এই যুগের বিখ্যাত শিক্ষাসক ছিলেন। মেহরৌলি লৌহস্তম্ভ, নালন্দায় প্রাপ্ত তামার বুদ্ধমূর্তি, ও রৌপ্য মুদ্রা ও সিলমোহরগুলি এই যুগে ধাতুবিদ্যার উন্নতির প্রমান।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট এই যুগের সন্তান। তিনি পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিকগতি, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেন।

আর্যভট্ট

পিথাগোরাসের 'থিয়োরেম' এবং ত্রিকোণমিতির 'সাইন', 'কোসাইন' প্রভৃতি চিহ্নের সাহায্যে গ্রিকরা পরিচিত ছিল। 1-9 পর্যন্ত সংখ্যার আবিষ্কার, শূন্য ও দশমিকের ব্যবহার গ্রিকরাই প্রথম শুরু করেছিল। এই যুগে অনেকজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন বরাহমিহির। এছাড়া ব্রহ্মগুপ্তের নিউটনের আবির্ভাবের বহু আগেই বলেছিলেন যে বস্তুসমূহ পৃথিবীর কেন্দ্রের টানেই মাটিতে পড়ে।

। গুহামন্দির , স্থাপত্য ,
ভাস্কর্য , চিত্রশিল্প

গুপ্তযুগে ইট পাথরের সাহায্যে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়েছিল। এই যুগে কয়েকটি স্থাপত্যের নিদর্শন হল দেওগড়ের দশাবতার মন্দির, কোটেশ্বর মন্দির, তিগোয়ার বিষ্ণু মন্দির, ভুমারের শিবমন্দির, সাঁচির মন্দির, ভিটারগাওয়ের ইটের মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, অজন্তা, ইলোরা ও উদয়গিরির গুহামন্দির। অজন্তা ও ইলোরা গুহাচিত্রগুলি অনন্য। গুপ্তযুগে মানুষের মূর্তি গড়ার রেওয়াজ দেখা যায়। এই যুগে বিখ্যাত ভাস্কর্য কর্মের উদাহরণ হল - সারনাথের বুদ্ধ মূর্তি, সাঁচির - বোধিসত্ত্বের মূর্তি। এই যুগে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম নানাভাবে পরিবর্তিত ও সুসংস্কৃত হয়। বাইরের বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্পর্ক নিবিড় সংযোগ গুপ্ত যুগে গড়ে ওঠে।

অজন্তা গুহাচিত্র

■ হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ■

গুপ্ত যুগকে অনেকে 'হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ' বলে চিহ্নিত করেন। বলা বাহুল্য এ মত ঠিক নয়। পুনরুত্থানের যুগ নয়। বরং এই যুগকে 'হিন্দু ধর্মের পুনর্গঠনের যুগ বলা যেতে পারে। হিন্দু ধর্ম কখনোই অবলুপ্ত হয়নি। মৌর্যযুগে সাময়িকভাবে তা স্তিমিত হয়ে পড়লেও, গুপ্ত যুগের বহু পূর্বেই তার অগ্রগতির সূচনা হয়। তাই প্রখ্যাত জার্মান ইতিহাসবিদ ও তোরত তাত্ত্বিক ম্যাক্সমুলার গুপ্ত যুগকে 'হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের যুগ' বলে চিহ্নিত করেন। এই যুগে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র তাদের গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন এবং শিব, বিষ্ণু, কার্তিক, গণেশ, দুর্গা, কালী লক্ষ্মীর উপাসনা শুরু হয়। তাদের পূজোর জন্য নতুন নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি রচিত হয়। গুপ্ত রাজারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী হলেও তারা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সেনাপতি আম্রকার্দব ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী বীরসেন ছিলেন বুদ্ধের উপাসক।

■ মূল্যায়ন

সাম্প্রতিককালে রোমিলা থাপার, রনবীর চক্রবর্তী, D.N ঝাঁ প্রমুখ ঐতিহাসিক গুপ্ত যুগকে সুবর্নযুগ বলার পক্ষপাতি নন। তাদের মতে —

1) গুপ্ত যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি উঁচু তলার মানুষের জন্যেই সৃষ্টি নিম্নশ্রেনির মানুষের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না।

2) গুপ্ত যুগে সাহিত্যের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। যা ছিল শিক্ষিত মানুষের ভাষা। সাধারন মানুষের মুখের ভাষা প্রাকৃত অবহেলিত ছিল।

3) এই যুগে শিল্প বানিজ্য মন্দা দেখা দিয়েছিল এবং মুদ্রার অভাব ও নগরের অবনতি লক্ষ্য করা যায়।

4) এই যুগে ভাস্কর্য চিত্রে ও নাটকে সাধারন মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী ঠাঁই পায়নি।

5) এই সময় কৃষকের অবস্থা খুব খারাপ হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যের নানা স্থানে ভূমিদাস প্রথার উদ্ভব ঘটেছিল।

6) নারী সমাজ সম্পূর্নভাবে ছিল পুরুষদের নিয়ন্ত্রনাধীন। নারীদের বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহপ্রথা বেড়ে গিয়েছিল।

7) সমাজে নীচু তলার মানুষেরা ধর্মের অযোগ্য বলে ধারনা শক্তিশালী হয়েছিল।

এইসব কারনে এই কথা বলা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত যে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগ 'সুবর্নযুগ' হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে এই যুগকে স্বর্ন যুগ বলা যায় না।

তথ্যসূত্র

1) খাদ্যের পরিচয় - জীবন মুখোপাধ্যায়।
2) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস - সুনীল চট্টোপাধ্যায়।
3) 'A History of Ancient and Early medieval India: From the stone Age to the 12th century.' - upinder Singh

Tanushree Thandar
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

Mrityunjoy Sarkar.
শিক্ষকের স্বাক্ষর

তারিখ – 31.05.2023